প্রথম অধ্যায়

নারী প্রগতির ধারা : পাশ্চাত্যে ও প্রাচ্যে

প্রথম অধ্যায়
নারী প্রগতির ধারা : পাশ্চাত্যে ও প্রাচ্যে

নারী প্রগতি ভাবনা বিশেষভাবে আলোচিত একটি বিষয়। এর গভীরে পুরুষ প্রাধান্যের শিকড় প্রোথিত রয়েছে। পুরুষতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা পরিবারতন্ত্রে, আর নারীকে শৃঙ্খলিত রাখার মধ্যে তার বিস্তার। নারী জন্মসূত্রেই অবলা — কারণ বিধাতার প্রথম সৃষ্টি পুরুষ, নারী এসেছে পরে। যদিও এই ভাবনাকে মিথে পরিণত করার দায়িত্ব পালন করে চলেছিল পুরুষ। নারী তাই পুরুষ নির্ভরশীল, আর সেই নারীর সঙ্গে একমাত্র সর্বংসহা ধরিত্রীরই তুলনা চলে আসছে। উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পুরুষ হয়ে উঠল ক্ষমতাশালী। এরপর পুরুষ নিজের উত্তরাধিকারির সন্ধান পেল নারীর মধ্যে। তাই নারীর জন্য রইল গন্ডীবদ্ধ গৃহজীবন। পুরুষ এমন এক সভ্যতা গড়ে তুলল যেখানে নারীকে পিছিয়ে না রাখলে বুঝি পিতৃতন্ত্র ধ্বংস হয়ে যাবে। সমস্ত ক্ষমতা, অধিকার আধিপত্যের কেন্দ্রে রয়ে গেল পুরুষ। পিতৃতান্ত্রিক সভ্যতায় নারী শোষিত একটি শ্রেণীতে পরিণত হল। নামগোত্রহীন, শুধু জীবন ধারণের জন্য বেঁচে থাকা একটি শ্রেণী, সে হল নারী। মানব প্রজাতির অর্ধেক অংশ নারী পুরুষ-সৃষ্ট সমাজ ব্যবস্থায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে অবস্থান করতে লাগল। এইভাবে পুরুষ সম্পত্তি ও ক্ষমতার শীর্ষে থেকে নারীকে পরাজিত করতে লাগল। এবং এইভাবেই তৈরি হল লিঙ্গ বৈষম্য বা সমাজে নারী পুরুষের অসম অবস্থান। পার্থিব জগতে স্বাধীনভাবে বাঁচা, স্বাধীন থাকা, স্বনির্ভরশীল হওয়া প্রতিটি মানুষের পক্ষে গভীর প্রয়োজন। তার জন্য দরকার ইচ্ছাশক্তি ও অধিকারবোধ। প্রতিটি মানুষের বাঁচার অধিকারের সঙ্গে সাম্যের অধিকারবোধ থেকেই সমাজতন্ত্রের জন্ম। সমাজতন্ত্রে নারী-পুরুষের বিভাজন হয় না। সেখানে তার একটাই পরিচয় সে মানুষ। বাংলার নবজাগরণ জন্ম দিল শিক্ষিত বাঙালী ভদ্রমহিলা সম্প্রদায়ে, বহুস্তর যুক্ত নারীর সাংস্কৃতিক নির্মাণ শুরু হল — তার থেকেই সাহিত্য, শিক্ষা, নাটক, চলচ্চিত্র, বিজ্ঞাপন সর্বক্ষেত্রেই উন্নতির লক্ষ্য হল মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নারী সমাজ। তারাই অগ্রণী ভূমিকা নিলেন সর্বক্ষেত্রে। অর্থাৎ সমাজ-সমাজতত্ত্ব বদলে দিল নারী সমাজকে। এইভাবে নারীর সাংস্কৃতিক নির্মাণের মধ্যে দিয়ে পূর্বে প্রচলিত নারীর দেবত্বের ভাবনা থেকে

বাস্তবের ভাবনায় একটা যবনিকা উন্মোচিত হয়েছে, নারীর অলীক প্রতিমার ছবিটি ছিন্ন হতে শুরু করেছে। নৈঃশব্দ্যের বাতাবরণ থেকে বেরিয়ে এসে নারী নিজেকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছে। আর এইভাবেই নানা প্রশ্নে বিদীর্ণ হয়েছে নারীর মন ও মনন। সে প্রশ্ন করেছে কেন নারী দণ্ডিতের মত সমাজ থেকে শুধু সাজা পাবে? নিজেকেই নারী প্রশ্ন করেছে, কে সৃষ্টি করেছে নারীর বিরুদ্ধে সমাজের সব অনুশাসন? এ যুগের নারীর সংগ্রাম তাই ঘুরে দাঁড়ানোর সংগ্রাম যেখানে সে নিজেকেই প্রশ্ন করেছে কেন হারব? কেন ভাঙব? কেন পরবশ হয়ে থাকব? পুরুষ আছে যেখানে একইভাবে নারীও থাকবে সেখানে। অস্তিত্বের উৎস থেকে উৎসারিত ভাবনায় নারী নিজেকে খুঁজতে শুরু করে, পুরুষের সৃষ্টি অসম বিভাজনের ফ্রেম থেকে সে বেরিয়ে আসতে শুরু করে। তাই সমাজ বাস্তবতার এই অসম বিভাজন থেকে মুক্তি, লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ, নারী-পুরুষের সমানাধিকারের দাবী নিয়ে তৈরি হল নারীবাদী ভাবনা। পুরুষের দাসত্ব ও শোষণ থেকে মুক্তি এবং পুরুষ নির্মিত প্রথাসিদ্ধ নারী রূপটি ভেঙ্গে তার নিজস্ব একটি স্বাধীন সত্ত্বার বিকাশ ও নারী-পুরুষের সমান অধিকারের ভাবনা এই বিষয়গুলি স্থান পেল নারী প্রগতি ভাবনায়। এই প্রগতি ভাবনার ঐতিহাসিক সূত্র অনুসন্ধান করতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় ফরাসী বিপ্লবের কথা।

ফরাসী বিপ্লবকে (১৭৮৯-১৮১৫) যদি মানুষের অধিকার আদায়ের প্রথম কাল বলা যায় তবে তার আগে সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক অর্থাৎ সার্বিকভাবে সমাজজীবনের এক পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছিল। নবজাগরণের পূর্ববর্তী শতাব্দীতে ইউরোপের নানা দেশের সিংহাসনে রানীরা রাজত্ব করেছিলেন। এঁদের মধ্যে কুইন ইসাবেলা রাজা ফার্ডিনান্ডের সঙ্গে স্পেন জয় করেন। এবং স্পেনে স্কুল স্থাপন ও চার্চের সংস্কার ইত্যাদি কাজ করেছিলেন। পূর্ববর্তী শতাব্দী গুলোতে সিরিয়ার রানী ক্লিওপেট্রা, ইজিপ্টের রানী নেফারটিটি, ফ্রান্সের জোয়ান ও আর্ক, ম্যাসিডোনিয়ার রানী ওলিম্পাস, টিউডর রাজতন্ত্রের প্রথম রানী এলিজাবেথ (প্রথম) (১৫৩৩-১৬০৩) উল্লেখযোগ্য। প্রথম এলিজাবেথ বিদূষী রাণী ছিলেন।তিনি ছ'টি ভাষা জানতেন। তাঁর রাজত্বকাল ইংরেজ ইতিহাসে স্বর্ণযুগ ছিল। রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্রের কাঠামোতে ইউরোপীয় রাজনীতিতে অষ্টাদশ, ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে থেকেই বেশ কিছু নারী ক্ষমতায়নের পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করেছিলেন। অস্ট্রিয়ার

সম্রাজ্ঞী মেরিয়া থেরেসা (১৭১৭-১৭৮০), রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথরিন (১৭২৯-১৭৯৬), ফ্রান্সের রানী মেরি এ্যান্টোয়নেট (১৭৫৫-১৭৯৩), ইংল্যান্ডের রানী ভিক্টোরিয়া (১৮১৯-১৯০১) উল্লেখযোগ্য। ১৭৭৫ সালের মধ্যে দ্বিতীয় ক্যাথারিন সর্বাত্মক ক্ষমতাময়ী সম্রাজ্ঞী রূপে স্বীকৃতি পান। ১৭৮০ সালের আগে পর্যন্ত অস্ট্রিয়ার সম্রাজ্ঞী মেরিয়া থেরেসা ক্ষমতাময়ী ছিলেন। রানী ভিক্টোরিয়া ১৮৫৮ সালে ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি নিজেই ছিলেন একটি যুগের প্রতিনিধি যা 'ভিক্টোরিয়ান যুগ' নামে চিহ্নিত। এছাড়া ইংল্যান্ডের রানী এলিজাবেথ দ্বিতীয় (১৯২৬-১৯৮৪) 'ভারতেশ্বরী' রূপে রাজনৈতিক ক্ষমতাকে সর্বাত্মকভাবে প্রয়োগ করেছিলেন। সুতরাং সে যুগের পাশ্চাত্যের পরিমন্ডলে উচ্চবর্ণের নারী পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকারিণী ছিলেন। এঁরা রাজতন্ত্রেরই প্রতিভূ ছিলেন। তাই রাষ্ট্রব্যবস্থায় সর্বোচ্চে অবস্থান করেও এই সম্রাজ্ঞীরা সিংহাসন থেকে মাটিতে তাকান নি। যেটুকু উন্নয়ন হয়েছিল তা অভিজাত সম্প্রদায়ের জন্য। সেক্ষেত্রে নারী হয়েও আপামর নারী সমাজের মুখপাত্র রূপে এঁদের বিশেষ ভূমিকা ছিল না। তবুও নারীর ক্ষমতায়ন বলতে সেদিনের সম্রাজ্ঞীদের অবস্থানকে স্বীকার করতেই হয়।

ফরাসী বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বে অষ্টাদশ শতাব্দীর 'দীপ্তির যুগে' আবির্ভূত হলেন বেশ কিছু মনীষী। এঁরা হলেন ইংল্যান্ডের হিউম, রবার্টসন, জার্মানীতে লেসিং, কান্ট, গ্যেটে, শিলার, আমেরিকায় বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, ফ্রান্সের ভলটেয়ার, রুশো প্রমুখ। এঁদের চিন্তার বৈশিষ্ট্য হল বিজ্ঞানমনস্কতা, যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা। এই ভাবনাই পল্লবিত হল ফরাসী বিপ্লবের মধ্যে। ফরাসী বিপ্লব ফ্রান্সের সীমানা অতিক্রম করে সমগ্র ইওরোপে তথা সমগ্র বিশ্বে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, স্বাধীনতা ও সাম্যের আদর্শ সর্বত্র জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। ইউরোপের ইতিহাসে ফরাসী বিপ্লবের যুগ (১৭৮৯-১৮১৫ খ্রী:) এক যুগান্তকারী বিপ্লবের সূচনা করে।

১৭৬০ সালে ইংল্যান্ডে ঘটে গেল শিল্প বিপ্লব, স্থাপিত হল বহু কলকারখানা। আর সেই কারণেই প্রয়োজন হল উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত অজস্র শ্রমিকের। এই অবস্থায় রুজি রোজগারের প্রয়োজনে, সন্তানের মুখে অন্ন তুলে দেবার জন্য, এককথায় জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে, ঘর ছেড়ে নারী বেরিয়ে পড়ল — যোগদান করল কারখানায়। নারী সংসারের বাইরে শ্রমসাধ্য কাজে যুক্ত হল এবং পরিণত হল নারী শ্রমিকে। যে নারীর

পেলব, কোমল মূর্তি সমাজে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তার ভিত গেল নড়ে। তবে পুরুষতন্ত্রের ভাবনা এক্ষেত্রেও থেকে গেল। কলকারখানার প্রয়োজনে নারীকে শ্রমিক হিসাবে মেনে নিলেও যোগ্য পারিশ্রমিক দ্বারা পূর্ণ শ্রমিকের মর্যাদা ছিল না। পুরুষের তুলনায় নারীকে কম মূল্যে বেশি খাটানোর একটি সুলভ পথ পুরুষ তৈরি করে নিল। এইভাবে নারীশ্রম বিনামূল্যে, কখনও স্বল্প মূল্যে বিক্রি হতে লাগল। আর নারীশ্রমের উপর ভিত্তি করেই মুনাফার পাহাড় তৈরি হতে থাকল।

সমগ্র ইওরোপে জনগণের ব্যক্তি স্বাধীনতা বলতে কিছুই ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদী দর্শন রাজতন্ত্রের অসারতা উদঘাটন করতে লাগল। ফলে একটু একটু করে ভাবনা-চিন্তায় প্রজা বা সাধারণ মানুষ স্থান পেতে শুরু করে। এর ফলে রাজতন্ত্রে প্রগতিমূলক সংস্কার চেতনার প্রকাশ ঘটল। অষ্ট্রিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় যোশেফ, রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথরিন, প্রাশিয়ার রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডারিক, স্পেনের রাজা তৃতীয় চার্লস্, পর্তুগালের রাজা প্রথম যোশেফ — এঁরা প্রজাহিতৈষী ও প্রগতিশীল সংস্কারমূলক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করলেন। ফলে সমাজে একটা পরিবর্তনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে লাগল। শিল্প বিপ্লবের ফলে শ্রমিকরা শিখেছে সংঘবদ্ধ হতে, ফরাসী বিপ্লবের ফলে মানুষ জেনেছে সাম্য, স্বাধীনতা তাদের মৌলিক অধিকার। তবু মানুষে মানুষে স্বাধীনতা অর্জনে পার্থক্য থেকেছে; অর্থ সে পার্থক্যের কারণ। আবার নারী ও পুরুষের অধিকারের জায়গাটি সমান ছিল না।

ফরাসী বিপ্লবের সময় মেয়েরা বাস্তিল দুর্গে মিছিল করে গিয়েছিল। সময়টা ছিল ১৭৮৯ সালের ১৪ই জুলাই। সেদিনের মেয়েরা খাদ্যের দাবীতে মিছিল করেছিল, পরবর্তীকালে তারা 'রুটি ও গোলাপ' এর জন্য আন্দোলন করেছে। অর্থাৎ শুধু খাদ্য নয়, একটি উন্নততর জীবন তাদের দাবীর তালিকায় ছিল। এই দাবী এরপর পরিবর্তিত হল রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের দাবীতে।

ফরাসী বিপ্লবের দাবী সনদটি হল 'Declaration of the Rights of Man' — যা পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট। এখানে নারীর দাবী অগ্রাহ্য হলে ১৭৯১ সালে 'অলিম্প দ্য গজ' 'Declaration of the Rights of Woman' গ্রন্থটি রচনা করলেন, যাতে রাষ্ট্রের কাছে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের দাবী পেশ করা হয়। ১৭৯২ সালে মেরি ওলস্টন

ক্রাফট্ (১৭৫৯-১৭৯৭) লিখলেন 'A Vindication of the Rights of Women' নামক গ্রন্থটি। এই গ্রন্থটিকে "অকাট্য নীতিপ্রণালীভিত্তিক নারীমুক্তির প্রথম সুপরিকল্পিত প্রস্তাব, ইশতেহার, ঘোষণা, নারীবাদের আদিগ্রন্থ" বলে মনে করেছেন বিশিষ্ট লেখক হুমায়ুন আজাদ। *(পৃ: ২৬১, হুমায়ুন আজাদ, নারী, আগামী, ঢাকা, ১৯৯২)।* ১৭৯৩ সালের ফেব্রুয়ারীতে প্যারিসের বেশ কয়েক'শ মেয়ে বিপ্লবী প্রজাতন্ত্রী নারী সমিতি গঠন করেন। এইভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে ইউরোপে সামাজিক পট বদল হতে লাগল, নারী কণ্ঠ আর অশ্রুত থাকল না। "শ্রমিক আর মালিকের সমবায়ভিত্তিক জীবনযাত্রার পথ নিয়ে ১৮০৮ সালে ফ্রাঁসোয়া ফ্যুরিয়র (১৭৭২-১৮৩৭) তত্ত্ব প্রকাশ করেন। তাঁর মতে মেয়েদের অবস্থান হল একটা সমাজের উন্নতির মাপকাঠি।" — *(পৃ: ৫৬, শাশ্বতী ঘোষ, সমতার দিকে আন্দোলনে নারী : প্রথম পর্ব, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৯৯)*

১৭৭৬ সালে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ ও ১৭৯০ সালে দাসপ্রথার অবসান — এই দুটি আন্দোলন যুগান্তকারী ঘটনা। কারণ কিছুটা হলেও মানুষ মানুষের মর্যাদা আদায় করতে শুরু করেছে। ধীরে ধীরে সমাজতন্ত্রবাদের ভাবনার প্রকাশ হতে লাগল। যেখানে ব্যক্তি বা শ্রেণী বিশেষের পরিবর্তে সমতার ভিত্তিতে অর্থ বন্টন ছিল মূল কথা। সমাজতন্ত্রবাদের মূল লক্ষ্য হল সাম্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠা — কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) যে মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ ছিলেন। বিভিন্ন দেশে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় যে শ্রমিক আন্দোলনগুলি সংঘটিত হয়েছিল তাকে একটি আন্তর্জাতিক মাত্রা দান করেন তিনি। ১৮২৯ সালে ইংল্যান্ডে শ্রমিক সঙ্ঘ আইনী স্বীকৃতি পেলে লন্ডনে ৬০ জন শ্রমিক নারী মিলে 'Society of Industrial Female' গঠন করেন। ১৮৩০ সালে ইংল্যান্ডের চার্টিস্ট আন্দোলনে নারীর শিক্ষা ও অধিকার, ১৮৩৬ সালে রিফর্ম বিলে নারীকেন্দ্রিক সমস্যাগুলির সংযুক্তি সাধন হল। শ্বেতাঙ্গ পুরুষের দ্বারা কৃষ্ণকায় দাস নারীদের প্রতিদিনের নিগ্রহের বিরুদ্ধে তৈরি হল একটি সংগঠন — ১৮৩৭ সালের 'ফিমেল এ্যান্টি স্লেভারি সোসাইটি', যেখানে শ্বেতাঙ্গ নারীরাও বিপ্লবের পথে পা রাখলেন। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে, স্বল্প পরিসরের ঘরে ১৬ ঘণ্টা ধরে দর্জি মেয়েদের আটকে রেখে কাজ করানো হত। ১৮৪৩-১৮৪৮ সালে নানা স্থানে এর বিরুদ্ধে শ্রমিক নারীরা আন্দোলন করেছেন। সেই অন্যায়ের

বিরুদ্ধে তৈরি হল 'লোয়েল ফিমেল লেবার রিফর্মস সোসাইটি' — যেখানে নেতৃত্ব দেন লোয়েল কাপড় কলের শ্রমিক আন্দোলনের নেত্রী সারা ব্যাগলী।

ভিক্টোরিয়া যুগে ইংল্যান্ডে নারীর অবস্থান চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল — উচ্চশ্রেণী, মধ্যবিত্ত শ্রেণী, উচ্চশ্রেণীর কর্মজীবী নারী, নিম্নশ্রেণীর কর্মজীবী নারী। চতুর্থ শ্রেণীর নারী ছিল দাস শ্রেণীভুক্ত। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে নারী পুরুষের ভেদ, আবার নারীর মধ্যে শ্রেণীগত স্ট্যাটাস বা অবস্থানগত ভেদও বজায় ছিল। এই বিভাজন নারীর নারীত্বকেই শুধু অপমান করে না, মানবাধিকারের সীমাও লঙঘন করে যায়। যাই হোক, ঊনবিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক এই পট-পরিবর্তন ও নানাভাবে নারীর প্রগতি ভাবনার উদয় হতে দেখা গিয়েছিল যেমন, তেমনি সামাজিক দিক থেকেও নারীর পরিবর্তিত অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। পরিবারের অভ্যন্তরে দাম্পত্য জীবনে নারীর অবস্থানটি পাশ্চাত্য দেশেও সুখকর ছিল না। অতি সহজে স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটা, স্ত্রীকে পথে বের করে দেওয়ার মত অপমানের শরিক ছিলেন শ্বেতাঙ্গিনী রমণীরাও। বিবাহিত নর-নারীকে একটি মানুষ 'married couple as one person' ধরা হত এবং সেইভাবেই বিবাহিত স্ত্রীর সম্পদ সবই তার স্বামীর কুক্ষিগত থাকত। এমনকি স্ত্রী উপার্জিত ধনের সবটুকুই পেত স্বামী। বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটলে বিবাহ-সূত্রে প্রাপ্ত স্ত্রীর সব ধন স্বামীর হয়ে যেত। সন্তানের অধিকার থাকত তার পিতার ওপর। এমনকি সহায়হীন, সম্বলহীন, আশ্রয়হীন নারীকে তাঁর স্নেহের ধন সন্তান থেকে বিচ্যুত করে রেখে বর্বরের মত আচরণ করা হত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে বৃটিশ রাজতন্ত্রের অধীনে বেশ কিছু সমাজ-সংস্কারমূলক আইনের প্রয়োগ নারীর মর্যাদাবৃদ্ধির সহায়ক হয়েছিল। ১৮৩৯ সালে The Custody of Infants Act পাশ হয় যাতে বিবাহ-বিচ্ছেদের পর শিশু সন্তানের অভিভাবকত্ব মায়ের ওপর বর্তায়। ১৮৪২ সালে আইন করে খনিতে নারী শ্রমিক নিয়োগ নিষিদ্ধ হল এবং দীর্ঘ সময়ব্যাপী নারীকে কাজে আটকে রাখাও নিষিদ্ধ ঘোষিত হল। ১৮৫৭ সালে অত্যাচারী স্বামীর থেকে পরিত্রাণের জন্য স্ত্রী বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন আইনী স্বীকৃতি পেল। এই পরিস্থিতিতে ১৮৬১ সালে মিসেস ইসাবেলা বিটনের Mrs. Beeton's Book of Household Management নামক পুস্তিকাটিতে (manual) গৃহকর্ত্রীকে আর্মির কমান্ডোরের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন, যাতে সংসারে সুষ্ঠ পরিচালনার জন্য গার্হস্থ্য

পরিবেশে নারী পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে পারেন। ১৮৬৬ এবং ১৮৬৯ সালে বারবণিতাদের স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা সুরক্ষার বিষয়েও কিছু কিছু আইন প্রণীত হয়েছিল। ১৮৭৮ সালে 'Matrimonial Causes Act', পাশ হয় যাতে বিবাহ-বিচ্ছেদের পর স্ত্রীকে খোরপোষ ও সন্তান-পালনের অর্থ স্বামীকে দিতে বাধ্য থাকার কথা বলা হয়। পরে এই আইনে স্বামী যদি হিংসা বা প্রতিশোধ পরায়ণ হয় তবে তার থেকে স্ত্রীকে আইনী সুরক্ষা দেওয়ার কথাও বলা হয়। অর্থাৎ নারীর স্বাধীন সত্ত্বা এই আইনে স্বীকৃতি পেল। ১৮৮৪ সালে 'Married Women's Property Act', ১৮৮৬ সালে 'Guardianship of Infants Act' পাশ হয় এবং এই সব আইন নারীর অধিকার আদায়ে, নারীর সমস্যাকে মানবিক দৃষ্টিতে বিবেচনা করার পথ দেখিয়েছে।

এই শতাব্দীতে এসেও চিকিৎসাবিদ্যাটি পুরুষের অধিগত ছিল। এরপর নারীর নার্স বা সেবিকার কাজটিকে সমাজ গুরুত্ব দিয়েছিল বলে ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গল (১৭৮৬-১৮৪৩) এর মত মহীয়সী নারীর অসামান্য অবদানকে সমাজ মনে রেখেছে। আর এর মধ্যে দিয়েই নারী পুরুষের অধীনতার অক্টোপাসের বন্ধন ছিঁড়তে শিখেছে — একটু একটু করে নিজেকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে আর এইভাবেই নারী প্রগতির পথ তৈরি হয়েছে।

সেই প্রেক্ষিতে দু'জন আমেরিকান নারী লুক্রিসিয়া মোট (১৭৯৩-১৮৫০) এবং এলিজাবেথ ক্যডি স্ট্যানটন (১৮১৫-১৯০২) যৌথভাবে 'Seneca Falls Declaration' নামে একটি ইস্তাহার রচনা করেন। ১৮৪৮ সালের ঐতিহাসিক সেনেকা ফল্স্ সম্মেলনে লিঙ্গ বৈষম্যের বিরুদ্ধে লিঙ্গ সাম্যের সপক্ষে সংগঠিত আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এইখানেই নারী ও পুরুষের সমান শিক্ষার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার সহ ভোটাধিকারের দাবী উত্থাপিত হয়। ক্লারা জেটলিন (১৮৫৭-১৯৩৩) ছিলেন সমাজতান্ত্রিক নারী আন্দোলনের অবিসংবাদী নেত্রী — যিনি শ্রমজীবী নারী আন্দোলনকে সংগঠিত করেন এবং তিনিই প্রথম কোপেন হেগেনের বিশ্বনারী সম্মেলনে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনের প্রস্তাব পেশ করেন।

এরপর শুরু হল ভোটাধিকার আন্দোলন। মেয়েদের মনুষ্যেতর প্রাণী ভাবা হত — যার থেকে তাদের অন্য অনেক কিছুর অধিকারের সঙ্গে ভোটাধিকারও ছিল না। ১৮৩০

এর দশক থেকে পৃথিবীর নানা প্রান্তের নারীরা তাদের রাজনৈতিক অধিকার ভোটাধিকারের দাবীতে সোচ্চার হয়েছিল। ১৮৪৭ সালে তৈরি হল 'উইমেন্স পলিটিক্যাল ইউনিয়ন'। ১৮৫১ সালে মহিলাদের ভোটাধিকার আন্দোলনের জন্য গঠিত হল 'Sheffield Association'. ১৮৬৬ সালে বিপুল সংখ্যক নারীর সাক্ষর সম্বলিত একটি আবেদন পত্র 'হাউস অব কমেন্স'-এ পেশ করা হয়। এই সময় হ্যারিয়েট, মিল প্রমুখ পুরুষ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বেরাও নারীর ভোটাধিকারের দাবীকে সমর্থন করেছিলেন। "১৮৮৬ সালে মারিয়া দেসরাইসাঁম প্রতিষ্ঠা করেন প্রথম ফরাসী নারী অধিকার সংঘ" *(পৃ: ৩৮০, হুমায়ন আজাদ, নারী, আগামী, ঢাকা, ৩য় সংস্করণ, ২০০২)।* নারীর পরাধীনতার যন্ত্রণার মূল কারণ অন্বেষণ ও তার প্রতিকারের উপায় বিশ্লেষণ করেছেন ১৮৬৯ সালে জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-১৮৭৩) তাঁর 'The Subjection of Woman' গ্রন্থে। রচিত হল জার্মান ভাষায় আগস্ট বেবেলের গ্রন্থ 'নারী ও সমাজতন্ত্র' ১৮৭৯ সালে। ১৮৮৩ সালে এরই সংশোধিত সংস্করণ 'নারীর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ' নামে প্রকাশিত হয়। সম্পত্তির মালিকানা ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভাবনা থেকেই যে লিঙ্গ বৈষম্যের সূত্রপাত সেকথা জানালেন ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্ (১৮২০-১৯৮৫) তাঁর ১৮৮৪ সালে রচিত 'The Origin of the Family, Private Property and the State' গ্রন্থটিতে। ১৮৯০ সালে জার্মান সমাজতন্ত্রী নারীরা সমবেতভাবে তৈরি করলেন 'উইমেন্স ব্যুরো'। আর ১৯০৩ সালে এই সমস্ত আন্দোলনের একটি সংহত রূপ তৈরি হল যখন এমোলিন প্যাংকহার্স্টের নেতৃত্বে যুক্তরাজ্যে নারীর সামাজিক ও রাজনৈতিক ইউনিয়ন গঠিত হয়। ১৯০২ থেকে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত কাপড়কলের শ্রমিক থেকে সমাজের প্রায় সর্বস্তরের নারীরাই নারীর ভোটাধিকারের জন্য সরব হয়েছিলেন, এমনকি এই ইস্যুতে ১৯১১ সালে পরিবহন ধর্মঘটও হয়েছিল। ১৯০৮ সালে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েরা প্রথম প্রবেশাধিকার লাভ করে। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হয়। ভারতবর্ষের বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৮৮০-১৯৪৬) ও মানবেন্দ্র নাথ রায় (১৮৮৯-১৯৫৪) এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অবশেষে ১৯১৮ সালে ইংল্যান্ডে নারীর ভোটাধিকার স্বীকৃতি পেল। এই সমস্ত আলোচনা থেকে দেখা গেল যে সাধারণ মানুষ, সাধারণ মানুষের হয়ে কথা বলেছে। এমন একটি শ্রেণী নেতৃত্ব দান করেছেন যারা

তথাকথিত অভিজাত শ্রেণীর মানুষ নয়।

উনবিংশ বিংশ শতাব্দীর বদলে যাওয়া সময়ে মূল্যবোধের পরিবর্তন, পুরনো ধারণাকে ভেঙ্গে নূতনভাবে নারী সত্ত্বার উদঘাটন সাহিত্যে তার প্রতিফলন দেখা যায়। পঞ্চাদশ শতাব্দীতে ক্রিস্টিনি দি পিসানের 'The Book of the City of Ladies' (১৪০৫), ষোড়শ শতাব্দীতে জেন এ্যাঙ্গারের 'Her Protection for Woman' (১৫৮৯), হেনরিচ করনিলিয়াস এগ্রিপ্পারের 'The Superior Excellence of Women overMen' (১৫৮৯), সপ্তদশ শতাব্দীতে এপ্রাবেহেনের (১৬৪০-১৬৮৯) 'The Adventure of the Black Lady' ইত্যাদি রচনায় নারীবাদের সূচনা হয়েছিল। এরপর জেন অস্টিনের 'Pride and Prejudice' (১৮১৩) গ্রন্থটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। এখানে মিস্ এলিজাবেথ বেনেট একজন বিদ্রোহী, স্বাধীন চিন্তাশীল, আত্মনিয়ন্ত্রিত নারী চরিত্র, যার সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা সেদিনের ইংরেজি সাহিত্যে বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। 'Progress of Enlightenment'-এর প্রতীক চরিত্র মিস এলিজাবেথ বেনেট। এছাড়া মার্গারেট ফুলারের 'Woman in the Nineteenth Century' (১৮৪৭), হ্যারিয়েট জ্যাকবের 'Incidents in the Life of a Slave Girl' (১৮৬৯), ফ্লোরেন্স ক্ল্যাসটনের 'The Adventures of a Woman in Search of her Rights' (১৮৭৪), মেরি হাউল্যান্ডের 'Pape's Own Girl' (১৮৭৫) ইত্যাদি গ্রন্থে নারী যে নানা পরিবেশ-পরিস্থিতির শিকার তার যন্ত্রণাময় চিত্রের পাশাপাশি অধিকার অর্জনের জন্য লড়াইয়ের চিত্র রয়েছে। কিছুক্ষেত্রে সফলতা আছে। তাছাড়া ইবসনের 'A Doll's House' (১৮৭৯) নাটকে দেখিয়েছেন নোরা হেলমার স্বামী, গৃহ, সন্তানের বৃত্তের মধ্যে নারীজীবনের পূর্ণতা পায়নি, কারণ তার ব্যক্তিত্ব সেখানে বিকশিত হতে পারে না, তার নিজস্ব সত্ত্বা সেখানে অবহেলিত হয়। তাই একদিন সেই সাজানো পুতুল ঘর ছেড়ে নোরা এসেছে এক সত্যের উপলব্ধি নিয়ে 'to see who is right, the world or I?' এখানেই নোরা আত্ম অনুসন্ধান করেছে। আবার বোলেসল প্রুসের 'The New Woman' (১৮৯৮), কেটি চপিনের 'The Strom' (১৮৯৯), 'The Awakening' (১৯০৫), বার্নাড শ'র 'Pygmalion' (১৯২৯), ভার্জিনিয়া উলফ্-এর 'A Room of One's Own' (১৯২৯) ইত্যাদি গ্রন্থে নারী সত্ত্বার জাগরণ ঘটেছে। ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্ তাঁর 'A

Room of One's Own' গ্রন্থে পুরুষতান্ত্রিক ভাবনাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। পরবর্তীকালে ইংরেজি সাহিত্যে নারীবাদী লেখিকা কমলা দাস তাঁর কাব্য রচনাতে নূতনত্ব এনেছিলেন। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে — 'She is the first women poet to crack the mould and establish an attitude and view point the Indian readers were quite unfamiliar with.'

কমলা দাস বলেছেন —

'I wore a shirt and my brother's trousers

Cut my hair short and ignored my womanliness.' *(Page 4, Edited by Manmohan K. Bhatnager, Feminist English Literature, Atlantic Publishers and Distributors, New Delhi, 2002).*

পাশ্চাত্যের নারী প্রগতির ইতিহাসের পাশাপাশি ভারতবর্ষের নারী প্রগতির ইতিহাসটিও দেখে নেওয়া যাক্। বেদের আমল থেকে নারী ও শূদ্র জাতির মানুষ এক শ্রেণীতে অবস্থান করেছে সমাজের চরম অবহেলার সামগ্রী হিসাবে। মহাভারতের যুগে গঙ্গা-জাহ্নবী (অবশ্যই শান্তনু পত্নী হিসেবে), সত্যবতী, কুন্তী, দ্রৌপদী-র মতো নারী চরিত্রে কিছু ব্যতিক্রমী রূপ তো আছেই। নারী শুধুই মাতৃত্বের দায় বহন, সন্তান প্রতিপালন ও সংসার যাপন — এই সমাজ অবস্থানে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত চলেছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিজাতি ও বিধর্মী রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে শাসকগোষ্ঠীর আগমনে এদেশের হিন্দু আচার সংস্কৃতির ধারা বহনকারী পরিবারগুলি বাড়ির চতুষ্পার্শে বিশাল উঁচু দেওয়াল তুলে নারীকে অত্যন্ত সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে দেয়। তবে এই সময়ে ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটেও নারীর ক্ষমতায়নের নিদর্শন মেলে। ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত চিতোরের রানী পদ্মিনী, সুলতানা রাজিয়া, চাঁদ সুলতানা, তারাবাঈ, অহল্যাবাঈ এসব মহিলা রানী ও জমিদারদের শাসনের কথা জানা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ক্ষমতায়নের শীর্ষে কয়েকজন মহিলা জমিদারকে পাওয়া যায় যাদের শাসনকালে স্বৈরাচার নয়, বরং মানবতা, স্বদেশপ্রেম, সাহিত্যানুরাগ, দানশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮২২ সালে মহিষাদলের রানী জানকী, মেদিনীপুরের জমিদার রানী শিরোমণি, রংপুরের রানী চৌধুরী উল্লেখযোগ্য। এছাড়া রানী রাসমণি, জমিদার মন্নুজান (১৭২২-১৮০৩) যিনি নারী শিক্ষায়

আগ্রহী ছিলেন, এঁদের কথা জানা যায়। ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী (১৮৩৪-১৯০৩), করিমুন্নেসা খানম (১৮৫৫-১৯২৬) — এদের রাজত্বকালে মন্দির স্থাপন, সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ, স্বদেশী আন্দোলন, স্কুল স্থাপন ইত্যাদি নানা মহৎ কাজের নিদর্শন পাওয়া যায়। সুতরাং প্রায় অশিক্ষিত বা স্ব-শিক্ষিত এইসব নারীরা ক্ষমতায়নের সঙ্গে মানব কল্যাণ সাধন করেছিলেন।

বেগম রোকেয়া সাখোয়াৎ হোসেনের জন্ম ১৮৮০ সাল, মৃত্যু ১৯৩২ সাল অর্থাৎ তাঁর জীবনের বিস্তার ঊনবিংশ শতাব্দীর আশির দশক থেকে, বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের প্রথমাংশ পর্যন্ত। সেদিক থেকে দেখতে গেলে তিনি যুগসন্ধিক্ষণের মানুষ। তৎকালীন বাংলাদেশের তথা ভারতবর্ষের সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক ও শিক্ষাগত ক্ষেত্রে যে প্রেক্ষাপট ছিল তা আলোচনার প্রয়োজন আছে। সেই কারণেই ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে ভারতবর্ষ তথা বঙ্গদেশের সমাজ-রাজনীতি-ধর্মনীতি-শিক্ষার পরিবর্তনে কীভাবে নারী প্রগতির ইতিহাস চিহ্নিত হয়ে রয়েছে তার সংক্ষিপ্ত একটি চিত্র এখানে তুলে ধরা হল।

নারী-পুরুষ সমান, তাদের অধিকারও অভিন্ন এবং মানুষের প্রকৃতি ও যোগ্যতা লিঙ্গ নিরপেক্ষ — এইসব ভাবনা চিন্তা সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রকাশিত হতে লাগল। এমনকি ধর্মকেও নূতনভাবে বিশ্লেষণের প্রবণতা দেখা দিতে লাগল। তার ফলে ঘটে মানবতাবোধের উদ্বোধন। আন্তর্জাতিকতাবোধ, সমাজতান্ত্রিক মানসিকতার সৃষ্টি হল যা বদলে দিতে পেরেছিল অনেক পুরনো ধ্যান-ধারণাকে। এরই ফলশ্রুতি হিসেবে একটি প্রগতিশীল ভাবনা থেকে নারীর উন্নয়নের কথা ভারতবর্ষের শিক্ষিত পুরুষগণ চিন্তা করেছিলেন। ধর্মীয় সংস্কার যা সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর অবমূল্যায়নের অন্যতম কারণ তার পরিবর্তন ও সংস্কার সাধন হতে লাগল প্রথমে।

ইংরেজ আগমনের কারণে ও ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনের ফলে ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে এল নবজাগরণ। নবচেতনার আলোক পথে এলেন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-১৮৮৩), জ্যোতিবা ফুলে (১৮২৭-১৮৯০), মহাদেব গোবিন্দ রানাডে (১৮৪২-১৯০১), বাসুদেব বলবন্ত ফাদকে (১৮৪৫-১৮৮৩) প্রমুখ মনীষীবৃন্দ। হিন্দু পিতৃতন্ত্র নারীকে ধারাবাহিকভাবে বলি দিয়েছে

পুরুষতন্ত্রের কাছে। নানান সামাজিক সংস্কার ও কুসংস্কারে নারীজীবন পশুরও অধম ছিল। সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, পণপ্রথায় জর্জরিত নিষ্ঠুরতম পরিস্থিতির শিকার এই নারী সমাজ। পাশাপাশি মুসলিম সমাজে নারী শোচনীয় পরিস্থিতির শিকার। হিন্দুমতে সতীদাহ প্রথা হয়ত মুসলিম সমাজে ছিল না, কিন্তু উভয় সমাজেই বাল্যবিবাহ, পুরুষের বহুবিবাহ, নারীর অশিক্ষা, বৈধব্যের যন্ত্রণা এমনকি মুসলিম সমাজে বাঁদীপ্রথা পর্যন্ত বজায় ছিল যা পুরুষতন্ত্রের যূপকাষ্ঠে নারী নির্যাতনের দলিল হয়ে রয়েছে। নানা আন্দোলনের পর ১৮২৯ সালে সতীদাহ নিষিদ্ধ, ১৮৫৬ সালে বিধবাবিবাহ আইন পাশ, ১৮৭২ সালে নূতন বিবাহ বিধি বা তিন আইন পাশ, ১৮৯১ সালে সহবাস সম্মতি আইন প্রবর্তন ও সঙ্গে কৌলীন্য প্রথা বিরোধী আন্দোলন ইত্যাদি নারীকল্যাণমূলক কর্মধারা লক্ষ্য করা গেল। গোটা উনিশ শতক ধরে হিন্দুনারীর যন্ত্রণা-জর্জর জীবনের অবসান ঘটানোর প্রক্রিয়া চলেছে। কিন্তু মুসলিম সমাজ তাদের নারীর জন্য কিছু করে নি। এতদিন পর্যন্ত সাহিত্যে নারীর রোমান্টিক মূর্তি, তার সেবিকার মূর্তি, তার ধার্মিক, পতিব্রতা মূর্তিই অথবা স্বর্গের দেবতা বা সম্রাজ্ঞীর মত অধরা অপ্রাপনীয়া মূর্তি রচিত হয়ে এসেছে। এবার প্রগতিচেতনার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নারীর প্রকৃত স্বরূপ যা পুরুষতন্ত্রের তলায় চাপা ছিল, সেই রূপটি একটু একটু করে স্পষ্ট হতে লাগল। বিদ্যা, বুদ্ধি, মেধা, মননের যে বিভাজন হয় না এই যুগের নারী তার প্রমাণ রেখেছে। উনিশ শতকেই নারী শিক্ষার অঙ্গনে পা দিয়েছে, ডিগ্রিধারী হয়েছে, চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শী হয়েছে।

অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে বিশ্বে যে নারীচেতনার পরিবর্তন তার মূলমন্ত্র ছিল নারীমুক্তি। আর সেই মুক্তির পথ তৈরি হতে লাগল নারীশিক্ষার প্রচলনের মাধ্যমে। শিক্ষা এনে দিল চেতনা। বাইরে থেকে এই চেতনাই রাঙিয়ে দিল নারীর অন্তর্লোককে। তারই ফলে দানা বাঁধল নারী প্রগতির সুনিশ্চিত ভাবনা ও সচেতনতা। ব্যক্তি বিশেষের বিদ্রোহ, পুরনো ধারণাকে অস্বীকার করে এগিয়ে আসা, শিক্ষায়, সাহিত্য সৃষ্টিতে, কর্মধারায় যেখানে পুরুষের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল নারীর সেইসব ক্ষেত্রে পুরুষের পাশে স্থান করে নেওয়ার মধ্যে দিয়ে নারীর অধিকার সচেতনতার প্রকাশ ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে শুরু হয়ে বিংশ শতাব্দীতে এসে বিস্তৃতি লাভ করে।

সাহিত্য ক্ষেত্রেও পরিবর্তনের সূচনা হল নূতন সমাজ চেতনার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে।

বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩) 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র (১৮৬২) মধ্যে দিয়ে নারীর ব্যক্তিত্বের ও স্বাতন্ত্র্যের উদ্বোধন ঘটেছে। পৌরাণিক নারীরা হয়ে উঠেছেন প্রতিবাদী। মহিলাদের চিন্তা-চেতনার জগৎ হয়েছে প্রসারিত। মহিলাদের সম্পাদনায় পত্রিকা প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। মোক্ষদাদায়িনী মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'বঙ্গমহিলা' (১৮৭০), থাকমণির সম্পাদনায় 'অনাথিনী' (১৮৭৫) পত্রিকায় নারী নিজের কথা বলার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। বাংলা উপন্যাসের প্রথম স্থপতি বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৮-১৮৯৪) 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮) উপন্যাসের প্রধান নারী চরিত্র ভ্রমর আত্মমর্যাদাবোধে উদীপ্ত হয়ে উঠেছে; যে সময়ে স্বামীই একমাত্র নারীর গতি, একমাত্র পরমদেবতা সে সময়ে এই চরিত্র, স্বামীকে ছেড়ে পিত্রালয়ে চলে আসার সাহস দেখিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরানী' (১৮৮৪) উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র প্রফুল্ল রূপের অন্তরালে দেবী চৌধুরানীর মধ্যে নারীর ক্ষমতায়নের একটি প্রচ্ছন্ন রূপ লুকিয়েছিল। এই একই সালে প্রকাশিত স্বর্ণকুমারী দেবীর 'ভারতী', কৃষ্ণরঞ্জিনী বসু ও শ্যামাঙ্গিনী দের সম্পাদনায় 'সোহাগিনী' পত্রিকাগুলি সে যুগের পরিবেশ পরিস্থিতিতে অভিনব। ১৮৮৫ সালে কৃষ্ণভামিনী দেবীর 'ইংল্যান্ডে বঙ্গমহিলা' গ্রন্থে রাজনৈতিক পরাধীনতা বিষয়ে প্রথম নারীর সচেতনতা প্রকাশ পেল। ১২৯৩ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যার ভারতী পত্রিকায় কৃষ্ণভাবিনী দাসের 'স্ত্রীলোক ও পুরুষ' প্রবন্ধটি বা 'সাহিত্য' পত্রিকায় কৃষ্ণভাবিনী দাসের 'শিক্ষিতা নারী' প্রবন্ধ, বাসন্তী কুমারী বসুর ১৮৯৯ সালের অন্তঃপুর পত্রিকায় 'স্ত্রীশিক্ষা ও বর্তমান অবস্থা', ১৯০৮ সালে বেগম রোকেয়া সাখোয়াৎ হোসেনের 'সুলতানার স্বপ্ন' — এ সবই নারীর ক্ষমতায়নের স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের সেতুবন্ধন ঘটিয়েছে। বিশেষ করে কৃষ্ণভাবিনীর 'শিক্ষিতা নারী' প্রবন্ধে যখন তিনি বলেন "স্ত্রী জাতি এ জগতে কেবল জ্ঞানবুদ্ধিহীনা হইয়া দাসত্ব করিবার জন্যই সৃজিত হয় নাই, কিংবা পুরুষের ক্রীড়ানিমিত্ত গঠিত নহে। পরোপকার ও অন্যের জন্য জীবনধারণ করা যেমন নারীর উদ্দেশ্য, রমণী তেমনি নিজের নিমিত্ত বাঁচিয়া থাকে।" *(পৃ: ১২১, সুতপা ভট্টাচার্য, মেয়েদের লেখালেখি, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৪)* এর মধ্যে দিয়ে শুধু নারীর দাবী দাওয়াই উত্থাপিত হয়নি, বরং বলা যায় সাহিত্যে নারীবাদী কণ্ঠ ধ্বনিত হয়েছে, যেমন হয়েছে বেগম রোকেয়াতে। অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকগুলিতে অসংখ্য লেখিকার আত্মপ্রকাশ

ঘটেছিল, যাঁরা সমাজজীবনে নারীর পরিবর্তিত অবস্থানকে চিহ্নিত করেছিলেন। ১৯১৩ সালে শরৎচন্দ্রের 'নারীর মূল্য' প্রকাশিত হয়েছে। ১৯১৪ সালে রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র'-এ মৃণাল পরিবারে অভ্যস্ত সংক্ষিপ্ত পরিসর থেকে মুক্তি চেয়েছে — প্রকৃতির উদার দাক্ষিণ্যের মধ্যে সেই মুক্তির আস্বাদ পেতে চেয়েছে। পুরুষতান্ত্রিকতার মধ্যেও নারীর নিজস্ব কণ্ঠস্বর তৈরি হচ্ছিল এই সময়ে।

সুতরাং দেখা যায় নারীরা পুরুষতান্ত্রিকতার মধ্যে বিরাজ করেও একটি নিজস্ব বলয় তৈরি করতে শুরু করেছিলেন। ভারতবর্ষের সামাজিক, জাতীয়তাবাদী ও রাজনৈতিক আন্দোলন এসে মিশেছিল নারী প্রগতি আন্দোলনের মোহনায়। মুসলিম সমাজে নারীর অবস্থার অবনতি হয়েছে চতুর্দশ শতাব্দীতে ফিরোজ তুঘলক (১৩৫১) থেকে সিকান্দার লোদীর (১৪৮৯-১৫৭৭) সময়কালে। কারণ নারীদের ধর্মীয় পবিত্র স্থানে যাওয়ার স্বাধীনতাও ছিল না, এমনকি বোরখা ছাড়া মেয়েদের চলাফেরা সর্বাবস্থায় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। বিপরীতদিকে শ্রীচৈতন্যের (১৪৮৬-১৫৩৩) আবির্ভাবের পর থেকে নারীকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দেওয়ায় বৈষ্ণবীরা শিক্ষালাভের সুযোগও পেতেন। তাঁরা ধর্মাচরণেও অংশ নিতে পারতেন। ফলে নারীর শিক্ষার বিষয়টি বৈষ্ণব ধর্মে স্বীকৃতি পায় এবং তার ফলে একপ্রকার নারী জাগরণ ঘটেছিল। এবং সেই কারণেই তার প্রভাবে বৈষ্ণবীদের দ্বারা অন্তঃপুরে নারীশিক্ষার একটি ধারা ঊনবিংশ শতাব্দীতে লক্ষিত হয়। আর হিন্দুধর্মের সতীদাহ ও কৌলীন্য প্রথার পীড়নে অনেক নারী তখন হয় মুসলমান, নয় বৈষ্ণব ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। ১৭৬৫ সালে ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলায় দেওয়ানী লাভ করে। কিন্তু রাজনৈতিক জীবনে, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার নানা পরিবর্তন হলেও সমাজ জীবনের অন্তর্গত যে পারিবারিক জীবন — তার কোন পরিবর্তন ঘটে নি। বরং গার্হস্থ্য জীবনে নানা বিধিনিষেধ আরোপ করে নারীর পায়ে বেড়ি পড়ানোর ব্যবস্থা দৃঢ় করা হয়।

আরো একটি বিষয়ে নারীর মূল্যহীনতার চিত্র পাওয়া যায়। কৌলীন্য প্রথার জন্য পুরুষ পেল বহু বিবাহের অধিকার। আর নারী তার পারিবারিক মর্যাদাটুকুও হারাল। স্বামীর মৃত্যুর পর কুলীন বধূটির স্থান হল কোন আত্মীয়ের বাড়িতে যেখানে অনেক বিড়ম্বনার সঙ্গে পুরুষ সদস্য দ্বারা তার লাঞ্ছনাও ঘটত। কারো আবার দাসীবৃত্তি করা ছাড়া বাঁচার অন্য পথ ছিল না। এরই মধ্যে কোন নারী নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে অথবা

শারীরিক আবেদনকে অস্বীকার করতে না পেরে অথবা পরিবারে স্বামী নয় এমন পুরুষ দ্বারা ব্যবহৃত হয়ে ঘর ছেড়ে পথে নামতে বাধ্য হত। "১৮৫৩ সালের অবিভক্ত বাংলার সরকারি রিপোর্টে জানা যায় যে, সে সময়ের কলকাতায় ১০ হাজার পতিতা মেয়ে ছিল কুলীন ব্রাহ্মণের স্ত্রী।" *(পৃ: ১০, চিত্রা দেব, অন্তঃপুরের আত্মকথা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৯৪)* এইভাবে কত অনাম্নী অঙ্গনা নাম-পরিচয়হীনভাবে তাদের জীবন অতিবাহিত করে গিয়েছিলেন যার কোন ইতিহাস লেখা হয়নি। ইংরেজ শাসনকালে হিন্দু নারীর সুরক্ষাকবচরূপে কয়েকটি আইন প্রণয়ন হয়। সতীদাহ রদ, বিধবা বিবাহ, সহবাস সম্মতি আইন ইত্যাদি বিষয়গুলিকে নিয়ে হিন্দু সমাজে লাগাতার আন্দোলন হয়েছিল। কিন্তু তার ফলশ্রুতিতে মুসলিম সমাজের পারিবারিক সম্পর্ক, বিয়ে, তালাক, খোরপোষ, সন্তানের অভিভাবকত্ব, সম্পত্তির উত্তরাধিকার ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়ে নারীর জন্য বিশেষভাবে ভাবনা চিন্তা করা হয়নি বলে কোন আন্দোলনও হয়নি। সেইজন্যেই মুসলিম ধর্মীয় আইনে বৃটিশ সরকার হস্তক্ষেপ করে নি। কারণ "এই সময়কালে মুসলিম নারীর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি পদক্ষেপ নির্ধারিত হয়েছে মুসলিম ধর্মীয় আইনের মাধ্যমে। ... একই দেশের একই শাসকের শাসনাধীনে নারী সমাজের জন্য দুই ধরনের অধিকার নির্দেশিত হলো।" *(পৃ: ২৩-২৪, মালেকা বেগম, বাংলার নারী আন্দোলন, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০০২, দ্বিতীয় সংস্করণ)।*

রামমোহন রায় ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন ১৮২৮ সালের ২০ আগস্ট। ব্রাহ্ম সমাজের নিয়মনীতির উদারতা ও মানবিকবোধসম্পন্ন হওয়ায় সমাজে অত্যাচারিত নারীগণ অনেকেই ব্রাহ্ম সমাজে এসে আশ্রয় পেত। ১৮৬৪ সালে ব্রাহ্ম নেতা গুরুচরণ মহালনবীশ একজন অত্যাচারিত হিন্দু বিধবাকে বিবাহ করেন। শুধু তাই নয় তিনি বাড়িতে ৩০/৪০ জন হিন্দু কুমারী, বিধবাকে আশ্রয় দিয়ে নারীর 'ত্রাতা' রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কেশবচন্দ্র সেনের (১৮৩৮-১৮৮৪) ব্রাহ্মিকা সমাজ (১৮৬৫) নারীমুক্তির বাতায়ন তৈরি করেছিল। প্রগতিকামী পুরুষ তার স্ত্রীকে নিয়ে জগৎসভায় উপস্থিত হয়েছেন। বরিশালের রাখাল রায় সস্ত্রীক এক ইংরেজ অফিসারের বাড়িতে বেড়াতে যান, গুরুচরণ মহলানবীশ ও তাঁর অনুগামীরা স্ত্রীদের নিয়ে প্রাতঃভ্রমণে যেতেন। বরিশালের ব্রহ্মময়ী দেবী ও সৌদামিনী দেবী পুরুষের সঙ্গে ব্রাহ্ম উপাসনা সভাতে উপস্থিত থাকতেন।

গুরুচরণ মহলানবীশ তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বন্ধুদের পরিচয় করিয়ে দিতেন। নারীকল্যাণকর আন্দোলনগুলির ফলশ্রুতি হিসেবে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বিশেষ বিবাহ আইন প্রচলিত হয়েছিল। তার ফলে অসহায় নারী আইনী সুরক্ষা দ্বারা নিজেদের অধিকার আদায় করতে আরম্ভ করেন। স্বামী সহবাস অপেক্ষা মৃত্যুকে শ্রেয় মনে করেন। "১৮৭০ সালে কৃষ্ণমণি নামে এক কুলীন স্ত্রী তাঁর স্বামী লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে খোরপোষের জন্য মামলা করে জয়ী হন। ১৮৭৬ সালে হিমবতী ও লোলিত মোহিনী নামের দুই কুলীন মহিলাও এরকম দুটি মামলায় জয়ী হন।" *(পৃ: ৫৫, মালেকা বেগম, বাংলার নারী আন্দোলন, ঐ)* ঢাকার বিধুমুখীও অপছন্দের পাত্রের সঙ্গে বিবাহে অরাজি হয়ে মামলা করায় জয়ী হন। ১৮৮৬ সালে বোম্বাই শহরের এক লড়াকু আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্না নারী রুক্ষাবাঈ অযোগ্য স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা করে কারাবাস ভোগ করেন, তবুও স্বামীর সংসারে ফিরে যান নি। এই ঘটনাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৩১-১৯৪১) 'শাস্তি' গল্পের জনমজুর পরিবারের নারী আত্মমর্যাদাময়ী চন্দরাকে মনে করিয়ে দেয়।

১৮৬৭ সালে ড: আত্মারাম পান্ডুরং এর প্রচেষ্টায় মুম্বাই এ প্রার্থনা সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, যার লক্ষ্য ছিল স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের সঙ্গে পর্দাপ্রথার অবসান। কেশব চন্দ্র সেন ১৮৭০ সালে 'ভারতীয় সংস্কার সমিতি' স্থাপন করেন। এই সমিতি যে পাঁচটি পৃথক কমিটি স্থাপন করে তার প্রথমেই ছিল নারীর উন্নতি ভাবনা। এই সমিতির কর্মধারায় ছিল — ১) নারী জাতির উন্নতি। ২) শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ও শ্রমিক কল্যাণ। ৩) সেবামূলক অন্যান্য কার্যকলাপ। ৪) দরিদ্রদের জন্য সুলভে পাঠ্য পুস্তক বিতরণ। ৫) মদ্যপান নিবারণ। এইসব কর্মধারার ফলে নারী অনেকটাই সাহসী হয়ে উঠেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে নারী নিজেই দায়িত্ব নিয়ে সমিতি স্থাপন করেছেন ও দক্ষ হাতে পরিচালনা করেছেন। ১৮৮২ সালে পণ্ডিতা রমাবাঈ (১৮৫৮-১৯২২) এর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় 'আর্য সমিতি'। ১৮৮৬ সালে স্বর্ণকুমারী দেবীর (১৮৫৫-১৯৩২) সখী সমিতি, ১৯১০ সালে নারী শিক্ষা সমিতি, কৃষ্ণভামিনী দাসের (১৮৬৪-১৯১৯) ভারত শ্রীমহামন্ডল (১৯১৩) ইত্যাদি সমাজকল্যাণকর সংগঠন গড়ে ওঠে। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে রাজনীতিতে বৃটিশ বিতাড়ণের জন্য যে ঝড় উঠেছিল, তাকে আরও গতিময় করে তুলেছিল রাজনৈতিক সচেতন নারী সম্প্রদায়। এঁদের মধ্যে মাদাম কামা (১৮৬১-১৯৩৬),

241115

18 DEC 2012

মোহিনী সেন (১৮৬৩-১৯৫৫), ভগিনী নিবেদিতা (১৮৬৭-১৯১১) ছিলেন, অন্যদিকে ছিলেন জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী (১৮৮৯-১৯৪৫) যিনি রাজনৈতিক দলে নারী স্বেচ্ছাবাহিনী গড়ে তোলেন, মনোরমা বসু (১৮৯৪-১৯৭২) ১৯২৪ সালে গড়ে তোলেন 'গেন্ডারিয়া মহিলা সমিতি', লীলা নাগ গড়ে তোলেন 'দীপালি সংঘ' ও 'দীপালি ছাত্রী সংঘ' (১৯২৬)। এইসব সংগঠনে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীরা অসামান্য ভূমিকা পালন করেন। জোবেদা খাতুন চৌধুরী (১৯০১) কাজী নজরুল ইসলাম (১৯০০-১৯৭৬) ও এ. কে. ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২) প্রমুখ ব্যক্তির ১৯২৭ সালের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বোরখা ছাড়াই প্রকাশ্য সভায় যোগদান করেন — যা সেদিনের মুসলিম সমাজকে বিচলিত করে তুলেছিল। "ময়মনসিংহের দুজন মুসলিম মেয়ে রাজিয়া খাতুন ও জালিমা খাতুন অল্প বয়সেই ১৯৩০-৩২ সালে কংগ্রেস আন্দোলনে যোগ দেন। ময়মনসিংহের বিপ্লবী যুগান্তর দলের সঙ্গেও তাঁদের যোগাযোগ ছিল। ১৯২৪ সালে কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে তাঁরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন এবং নির্যাতন বরণ করেন।" *(পৃ: ২৮৪, কমলা দাশগুপ্ত, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী, কলকাতা, ১৯৬০)* ঊর্মিলা দেবীর 'নারী কর্মমন্দির'-এ নেলী সেনগুপ্তা ও জ্যোর্তিময়ী গাঙ্গুলীদের সঙ্গে যোগদান করেন দৌলতুন্নেসা খাতুনও।

১৯২০ সালের ৩১ অক্টোবর মুম্বাই শহরে অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রমিক আন্দোলনের নেত্রী সুধা রায় ডক লেবার বোর্ডের প্রথম মহিলা সদস্য ছিলেন। চটকল শ্রমিক আন্দোলনের প্রথম নেত্রী সন্তোষকুমারী দেবী আর বেগম সাকিনা ফারুক মোয়াজ্জেদা কিংবদন্তী শ্রমিক নেত্রী ছিলেন। সরোজিনী নাইডু (১৮৭৯-১৯৪৯) "সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন ১৯২৬ সালে" — *(পৃ: ৫৭-৫৮, রেণু চক্রবর্তী, ভারতীয় নারী আন্দোলনে কমিউনিস্ট মেয়েরা (১৯৪০-১৯৫০), মনীষা গ্রন্থালয়, কলিকাতা, ১৯৮০)।* ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে সন্ত্রাসবাদের যে ধারা এসেছিল দুকড়িবালা দেবী, কল্পনা দত্ত, উজ্জ্বলা মজুমদার, লীলা নাগের মত নারীবৃন্দের অংশগ্রহণ প্রমাণ করেছে যে নারী পুরুষের সমান যোগ্যতাসম্পন্ন হয়ে উঠেছে — সে নিজেই পথ তৈরি করে, পথ দেখায়, আর হয়ে যায় নূতন যুগের পথিকৃৎ। ১৯২৭ সালে ঊর্মিলা দেবী 'ভারত নওজোয়ান সভা'র নেতৃত্ব দান করেন। তমলুকের ইন্দুমতী ভট্টাচার্য আজীবন চরকা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯২৮ সালের সাইমন কমিশন বয়কট

আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন ইলা সেন। জেলের অভ্যন্তরে রাজবন্দীদের চার্লস টেগার্ট অত্যাচার করলে বন্দীদের সঙ্গে তিনিও অনশন করে নারীশক্তির জয় ঘোষণা করেন। ১৯৩০ সালে আভা দত্ত প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দী অবস্থায় জাতীয় পতাকা তুলে এক অনন্য নজির সৃষ্টি করেন। ১৯৩২ সালে তমলুকে সমর পরিষদের ডিরেক্টর নির্বাচিত হন ইন্দুমতী ভট্টাচার্য। এইভাবে স্বাধীনতা আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলনে নারী তাঁর শক্তির স্বাক্ষর রেখে যায়। এবং এই বাতাবরণ নারীকে বাধা সরিয়ে প্রগতিমুখী করে তোলে।

শুধু শহরকেন্দ্রিক আন্দোলন নয়, বিভিন্ন মফঃস্বল শহরেও নারীর নেতৃত্বে রাজনৈতিক আন্দোলন সংঘটিত হয়। বাঁকুড়া জেলার শান্তশীলা পালিত, মেদিনীপুরের ঊর্মিলাবালা পারিয়া, নদিয়ার নির্মলনলিনী ঘোষ, বরিশালের প্রফুল্লমুখী বসু, দিনাজপুরের প্রভাব চ্যাটার্জী প্রমুখ এঁরা রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালিত করেন এবং সংগ্রামী আন্দোলনে প্রথম শ্রেণীর নেতৃত্ব দান করেন। *(দ্রষ্টব্য : সম্পাদিকা শ্যামলী গুপ্ত, একসাথে, আষাঢ়, ১৪১৬, গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, কলিকাতা)।*

১৯২৬ সালে নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের লিডার লেডি আব্দুল কাদির, ফাতিমা বেগম এবং পরবর্তীকালে ১৯৪১ সালে মূলত বেগম শায়েস্তা ইকরামুল্লাহের নেতৃত্বে 'মুসলিম লীগ মহিলা সমিতি' গঠিত হয়। সুতরাং এইসব আন্দোলনে ব্যাপকভাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের নারীদের অংশগ্রহণ এবং অল্প হলেও মুসলিম নারীদের নেতৃত্বদান নারী প্রগতিধারাকে ঊর্মিমুখর করে তোলে।

এই সময় একটি জাতীয়তাবোধ নারীকে প্রাণীত করেছিল বলেই সব বাধা অতিক্রম করে জাতীয় আন্দোলনে নারী ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, তাই খড়ির গণ্ডিটানা সীমানা অতিক্রম করে তাঁরা হয়ে উঠেছেন সাহসিকা। ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নারী চেতনায় বিপ্লব এনে দেয়। দেশের পরাধীনতার সঙ্গে নারী নিজেকে মিলিয়ে নিয়েছিল। আর তাই দেশ ও নারীমুক্তি যেন নারীর কাছে একাত্ম হয়ে দাঁড়ায়। সশস্ত্র ও অহিংস দুটি ধারাতেই নারী তার বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছে। এর সঙ্গে সভা সমিতি, সংগঠন, পত্র-পত্রিকা প্রকাশ হতে লাগল যার নিয়ন্ত্রা নারী। শিক্ষা, সাহস, বুদ্ধিমত্তা, মানবতা, জাতীয়তাবোধ, আত্মজাগরণ সব মিলে নূতন যুগের নূতন নারী প্রতিনিধিত্ব করেছে সর্বত্র। কিন্তু বাংলার মুসলিম সম্প্রদায় সামগ্রিকভাবেই অনেক পশ্চাদপদ থাকায় নারী শিক্ষাসহ নারী প্রগতি

ভাবনা কিছুটা দেরীতে হয়েছে। কিন্তু এরই মধ্যে চিন্তা-চেতনায় অগ্রণী কিছু মুসলিম মহীয়সী নারীর পরিচয় পাওয়া যায় যাঁরা মুসলিম নারীর শিক্ষার প্রসারে পথিকৃৎ ছিলেন। এর মধ্যে অন্যতম নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী। কি অপরিসীম মনোবলের অধিকারী ছিলেন তিনি, তাই সেই যুগের গভীর রক্ষণশীলতার গন্ডী অতিক্রম করে স্বামী পরিত্যক্তা এক নারী দুটি কন্যাসন্তানকে নিয়ে পিতার জমিদারীর দায়িত্বই শুধু গ্রহণ করেন নি, পিতার জমিদারী সীমানায় স্থাপন করেন একটি অবৈতনিক মাদ্রাসা, ১৪টি মৌজায় ১৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করে এবং উচ্চ ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে তিনি এই বার্তাই পৌঁছে দেন, যে শিক্ষা ব্যতীত নারীর মুক্তি নেই। করিমুন্নিসা খানমের (১৮৫৫-১৯২৬) অর্থানুকূল্যে ১৮৮৬ সালে আব্দুল হামিদ খান ইউসুফজীর সম্পাদনায় 'আহমেদী' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। মুসলিম নারী শিক্ষার ইতিহাসে তাঁর অবিস্মরণীয় অবদান নারী প্রগতির একটি মাইলস্টোন রূপে বিবেচিত হয়। বেগম রোকেয়া সাখোয়াৎ হোসেন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' (১৯১০) অবিভক্ত বাংলার অন্যতম মুসলিম নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যা আজও নারীশিক্ষার আলোকবর্তিকা বহন করে চলেছে। প্রথম মুসলিম মহিলাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত নারী সংগঠন 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম' (১৯১৬) প্রতিষ্ঠার কৃতিত্বও বেগম রোকেয়ার। রোকেয়া ও অন্যান্যদের প্রচেষ্টায় ১৯১৯ সালের শেষে সরকারী মুসলিম মহিলা ট্রেনিং স্কুল স্থাপিত হয়। এর শিক্ষায়িত্রীরা বেশীরভাগই 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলে'র ছাত্রী ছিলেন। ১৮৬৫ সালে বোদা বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী তাহেরেন্নুসা (সন জানা যায় না) 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় যে প্রবন্ধটি রচনা করেন, সেটিই তাকে প্রথম বাঙালী মুসলিম লেখিকার সম্মান এনে দিয়েছে।

মুসলিম বালিকা মাদ্রাসা ও স্কুল ছাড়াও ঊনবিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশক থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত সময়কালে তিনটি উল্লেখযোগ্য সমিতির অবদান মুসলিম নারী প্রগতির ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে, এগুলি হল সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এ্যাসোসিয়েশন (১৮৭৮), ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী (১৮৮৩) ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি (১৯০৩)। নারীর উন্নয়নকারী এই সমস্ত সমিতিগুলি নারীশিক্ষার জন্য দৃঢ় ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও নারীশিক্ষায় প্রবহমানতা আসেনি সেভাবে। সার্বিকভাবে মুসলিম নারীর লেখাপড়ার সুযোগ বেড়ে

প্রবহমানতা আসেনি সেভাবে। সার্বিকভাবে মুসলিম নারীর লেখাপড়ার সুযোগ বেড়ে গেলেও শরীয়ত, পর্দা ও ধর্মীয় কুসংস্কার মুসলিম নারীকে পিছিয়ে রেখেছিল। সেই জায়গা থেকে বেগম রোকেয়ার কর্মযজ্ঞের সূচনা। পিছিয়ে থাকা নারী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি তার বলিষ্ঠ হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তমসাবৃত অবস্থা থেকে আলোর অভিমুখী করেছিলেন নারীকে। তাই প্রগতি চেতনার দিশারী, নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া প্রথমেই বিদ্রোহ করেন পুরুষ নয়, পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে। আর তাঁর লেখনী পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক 'ধারাবাহিক ধর্মযুদ্ধ'। রোকেয়া স্বশিক্ষিত, তিনি হয়ত পশ্চিমী নারীবাদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর যুগরসে লালিত প্রগতি চেতনায় উদ্বুদ্ধ বেগম রোকেয়া মুসলিম সমাজের প্রথম নারী — তিনি বর্জন করতে চেয়েছেন পুরুষতন্ত্রের তৈরি নারীর ভাবমূর্তিকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষাসহ নানা সামাজিক আন্দোলন একটি নতুন শ্রেণীর নারী মুখকে উদ্ভাসিত করে তোলে। তারা হলেন 'ভদ্রমহিলা' — যারা তাদের সৃজনী প্রতিভা দিয়ে সাহিত্যে, শিল্পে, পত্র-পত্রিকা সম্পাদনায় সভাসমিতি স্থাপনে, নানাপ্রকার কর্মক্ষেত্রে যোগদান করে জাতীয় ও রাজনৈতিক আন্দোলনের শরিক হয়ে স্ব স্ব ক্ষেত্রে তাদের প্রগতিশীল ভাবনাকে সঞ্চারিত করে দিয়েছিলেন। মুসলিম সমাজে নারী জাগরণে, সমস্ত প্রগতিশীল ভাবনার এক সংহত রূপ সংগ্রামী নারী বেগম রোকেয়ার জীবন ও কর্মধারায় প্রকাশ পেয়েছে।

সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষাগত দিক ও ধর্মীয় দিক দিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে যে এক নূতন সমাজজীবন গড়ে উঠেছে, ধ্বংস ও নূতন সৃষ্টি নিয়ে কালের হাতে যে মন্দিরা বেজেছে তাকে ধরার চেষ্টা রয়েছে এই আলোচনায়। আর সেই প্রগতিশীল যুগে মেয়েদের আত্মজিজ্ঞাসা, অধিকারবোধ নিয়ে চিন্তাভাবনা, সংগঠন গড়ে তোলা, সাহিত্য সৃষ্টিতে নারী সচেতনতার ও উন্নততর একটি জীবনযাপনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে। সেই ভিত্তি ভূমিতে দাঁড়িয়ে একেবারে অসহায়, অবহেলিত মুসলিম নারীদের প্রতি সমাজের বৈষম্য ও নির্যাতন প্রদর্শনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে উঠেছিল। পৃথিবী জুড়ে সমাজতন্ত্রবাদের জয়যাত্রা, দাসত্ব ও বশ্যতা স্বীকারের গ্লানি অপসারণ করে নানা দিকে নারী আন্দোলন লড়াই ও সংগ্রামের পথে অধিকার আদায়ের এক নয়া ইতিহাস রচনা করেছে। মুসলিম সমাজে শুধু লেখনী দিয়ে শাণিত, ক্ষুরধার যুক্তি পরম্পরা সাজিয়ে গদ্য

রচনার মধ্যে বেগম রোকেয়া একাই পুরুষ আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন।

এই কর্মবীর নারীর একটি সংক্ষিপ্ত জীবনে প্রতিভার নানা রূপের বিকাশ লক্ষিত হয়। নারীর নিজস্বতা অন্বেষণের জন্য যে পথ অন্বেষণ — তিনি তাঁর সময়কালে মুসলিম সমাজের মধ্যে প্রথম সেই পথ তৈরি করেছেন। আর সেই পথ দিয়েই নারী প্রগতি ভাবনার প্রথম সূর্যোদয়। সীমাবদ্ধতায় নারীকে বন্দী রেখে হনন করা হয় তার মনন, মেধা ও সৃষ্টিশীলতাকে। সাংসারিক সীমাবদ্ধতার বাইরেও যে নারীর একটি অন্য পৃথিবী আছে, যা ব্যক্তি নারীর একান্তই নিজস্ব — সেই ভাবনা থেকে প্রগতি চেতনার যাত্রা। গৃহবন্দী রেখে নারীর নারীত্বের অবমাননা ও সেই একই অবস্থানে নারীকে স্থানু করে রেখেছে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ। গৃহকোণে যদি আলো না থাকে তবে তা কারাগারের সমান হয়ে যায়। আর সেই আলোই হল শিক্ষা — যার থেকে সযত্নে নারীকে সরিয়ে রাখার কৌশল, প্রক্রিয়া সভ্যতার প্রায় আবহমান কাল থেকে চলে আসছে। রোকেয়া সমাজের সংস্কারের কথা বলেননি। তিনি সমাজে নারীর অবস্থানের প্রথাগত কাঠামোকে ভেঙ্গে আমূল পরিবর্তনের কথা বলেছেন। বরং বলা যায়, একটি নূতন কাঠামো নির্মাণ করতে প্রথম অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। সব সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে নারীকে তিনি চেতনাবোধে উদ্দীপ্ত করতে চেয়েছেন। মননশীলতায় তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠদের মধ্যে একজন। পুরুষ নিজেদের বানানো বিধানকে উন্নীত করেছে সমাজ শাসনে, ধর্মের নামে, সমাজ শাসনের নামে সেইসব বিধানকে রোকেয়া আঘাত করে তার যুক্তিনিষ্ঠ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সমাজে পুরুষের একাধিপত্য ও নীরবে নারীর পুরুষ মুখাপেক্ষিতাকে তিনি বর্জন করে নিদ্রাচ্ছন্ন জাতিকে জাগ্রত করতে প্রয়াসী হয়েছেন এবং নারী প্রগতির একটি ধারা তৈরি করেছেন। বিবাহসূত্রে বিহারের ভাগলপুরবাসী। কিন্তু তাঁর কর্মস্থান ছিল কলকাতায়। এই শহরকে কেন্দ্র করে তাঁর কর্মধারার বিস্তার। প্রাচীন ও নবীন শতাব্দীর সন্ধিকালে এসে হিন্দু সমাজে রক্ষণশীলতার বাধা আস্তে আস্তে অপসৃত হলেও মুসলিম সমাজে সেই সময়েও রক্ষণশীল রূপ বজায় ছিল। আর সেই জায়গা থেকেই রোকেয়ার কর্মধারার সূচনা। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি ও কর্মময় জীবন, তার ভাবনার চিন্তা চেতনার অস্ত্র স্বরূপ — যা দিয়ে তিনি প্রান্তবাসিনী সমগ্র নারী-সমাজকে বৃহত্তর আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনের আঙিনায় এনে তাদের স্বাধিকার অর্জনের লড়াই করতে শিখিয়েছিলেন।